অধ্যায় - ৩১

মুক্তি দান

১) সন্ন্যাসী বিজয়ানন্দ ২) বালারাম মানকর ৩)নুলকর ৪) মেঘা ৫) একটি বাঘ।

বাবার সামনে কয়েকটি ভক্তের মৃত্যু ও বাঘের প্রাণত্যাগের কথা হেমাডপন্ত এই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

প্রারম্ভ ঃ-

মৃত্যুর সময় মনে যা শেষ ইচ্ছে বা ভাবনা জাগে, সেটিই ভবিতব্যতা নির্মাণ করে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (অধ্যায় ৮) বলেছেন "নিজের জীবনের শেষ সময় আমায় যে স্মরণ করে, সে আমাকেই প্রাপ্ত করে এবং সেই সময় সে যা দৃশ্য দেখে, সেটাই সে লাভ করে।" এটি কেউই হলফ্ করে বলতে পারে না যে সেই সময় আমাদের মনে উত্তম বিচারই জাগবে। বরং এমন মনে হয় যে মৃত্যু আসন্ন দেখে নানা কারণে ভয়ভীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। তাই মনকে কোন উত্তম বিচারের চিন্তনে লাগিয়ে রাখার নিত্যাভ্যাস অত্যন্ত আবশ্যক। সব সাধু-সন্তরা হরি নাম ও তার জপকেই শ্রেষ্ঠ বলেন- যাতে মৃত্যুর সময় আমরা কোন পরিবারিক সমস্যায় না জড়িয়ে পড়ি। ভক্তরাও সম্পূর্ণ ভাবে সন্তদের শরণাপন্ন হয় যাতে তাঁরা উচিত পথপ্রদর্শন করে তাদের সাহায্য করেন। এই কথারই কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া হচ্ছে -

১) বিজয়ানন্দ ঃ-

এক মাদ্রাজী সন্ন্যাসী বিজয়ানন্দ মানসরোবরের যাত্রায় বেরোন। পথে বাবার কীর্তির কথা শুনে উনি শিরডী আসেন এবং সেখানে হরিদ্বারের সোমদেবজী স্বামীর সাথে ওঁর দেখা হয়। স্বামীজীকে মানসরোবরের যাত্রা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করায় স্বামীজী জানান যে, মানসরোবর গঙ্গোত্রী থেকে প্রায় ৫০০ মাইল উত্তরের দিকে পড়ে। রাস্তায় যে-যে অসুবিধে ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় তাও উল্লেখ করেন। বরফে ঢাকা রাস্তা, ৫০ ক্রোশ অবধি ভাষার ভিন্নতা এবং ভূটান বাসীদের সন্দিগ্ধ স্বভাব ইত্যাদি নানা অসুবিধা হয়রানি করে থাকে। একথা শুনে সন্ন্যাসীর মন উদাস হয়ে

যায় এবং উনি যাত্রার বিচার ছেড়ে মস্‌জিদে গিয়ে বাবার শ্রীচরণ স্পর্শ করেন। বাবা রেগে ওঠে বলেন- "এই অপদার্থ সন্ন্যাসীকে এখান থেকে বার করে দাও। এর সঙ্গ করাও বৃথা।" সন্ন্যাসী বাবার স্বভাবের বিষয়ে একবারেই অপরিচিত ছিলেন। উনি বড়ই হতাশ হয়ে পড়েন- এক কোণে চুপচাপ বসে শুধু মস্‌জিদে লোকেদরে গতিবিধি দেখছিলেন। সকালবেলা দরবারে ভক্তদের বেজায় ভীড়। বাবার যথাবিধি অভিষেক করা হচ্ছিল। কেউ তাঁর পা ধুইয়ে দিচ্ছে, কেউ তাঁর চরণামৃত পান করছে বা চোখে লাগাচ্ছে। কেউ-কেউ তাঁকে চন্দন ও আতরও লাগাচ্ছিল। জাত-পাতের পার্থক্য ভুলে সবাই বাবার সেবায় মগ্ন ছিল। যদিও বাবা সন্ন্যাসীর উপর রেগে গিয়েছিলেন, তবুও সন্ন্যাসীর মন বাবার প্রতি গভীর প্রীতিতে ভরে ওঠে। ওঁর সেই স্থান ছেড়ে যেতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। এর দুদিন পরই মাদ্রাজ থেকে চিঠি আসে যে, ওঁর মায়ের অবস্থা চিন্তাজনক। এই খবর পেয়ে সন্ন্যাসী খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন এবং মায়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রগাঢ় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বাবার অনুমতি না নিয়ে উনি শিরডী থেকে যেতেই বা কি করে পারতেন? তাই হাতে চিঠিটা নিয়ে উনি বাবার কাছে যান এবং বাড়ী ফেরার অনুমতি চান। ত্রিকালদর্শী বাবা তো সবার ভবিষ্যত জানতেন। তিনি বলেন- "মায়ের প্রতি এত মোহ আছে তো সন্ন্যাস ধারণ করার কি দরকার ছিল? মমতা বা মোহ গেরুয়া বস্ত্রধারীদের কি শোভা দেয়? যাও, চুপচাপ নিজের জায়গায় গিয়ে কিছুদিন শান্তিতে কাটাও। কিন্তু সাবধান! 'ওয়াড়ায়' অনেক চোর আছে। তাই দরজা বন্ধ করে সাবধানে থেকো, নাহলে চোর সব চুরি করে নিয়ে যাবে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত পদার্থের মোহ ত্যাগ করে নিজের কর্তব্য করো। যে এই ধরনের আচরণ করে শ্রীহরির শরণে যায়, সে সব কষ্ট হতে মুক্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করে। **যে পরমাত্মার ধ্যান ও চিন্তন প্রেম ও ভক্তি সহকারে করে, পরমাত্মা তার সাহায্য অবশ্যই করেন।** পূর্বজন্মের শুভ সংস্কারের ফলস্বরূপই তুমি এখানে এসে পৌঁছেছ এবং আমি যা-যা বলছি, সেটা মন দিয়ে শোন। নিজের জীবনের মুখ্য লক্ষ্যের বিষয়ে চিন্তা করো। ইচ্ছারহিত হয়ে কাল থেকে তিন সপ্তাহ অবধি ভাগবৎ পাঠ করো। তখন ভগবান প্রসন্ন হবেন এবং তোমার সব দুঃখ দূর করে দেবেন। মায়ার আবরণ দূর হলে তুমি শান্তি পাবে।" ওঁর শেষ সময় আসন্ন জেনে বাবা ওকে এই উপায়টি বলেন। এরই সাথে 'রামবিজয়' পড়বারও আদেশ দেন, যাতে যমরাজ বেশী খুশী হন। পরের দিন স্নানাদি ও অন্যান্য শুদ্ধি কৃত্য সেরে সন্ন্যাসী 'লেণ্ডীবাগে' একান্তে বসে ভাগবৎ পাঠ শুরু করেন। দ্বিতীয় বার পাঠ শেষ হওয়ার পর উনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং 'ওয়াড়া'য় এসে দু দিন বিশ্রাম করেন। তৃতীয় দিন বাবার

কোলে উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দর্শনের জন্য বাবা ওঁর শরীর একদিন ওখানে রাখেন। তারপর পুলিশ এসে যথোচিত তদন্ত করার পর মৃতদেহ সরাবার অনুমতি দেয়। যথোপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে সমাধি দেওয়া হল। বাবা এই ভাবে সন্ন্যাসীকে সাহায্য করে তাঁকে সদ্‌গতি প্রদান করেন।

২) বালারাম মানকর ঃ-

বালারাম মানকর নামক এক গৃহস্থ বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। ওঁর স্ত্রীর স্বর্গবাস হওয়ায় উনি বড় নিরাশ হয়ে ঘর-সংসারের দায়িত্ব ছেলেকে দিয়ে নিজে শিরডীতে এসে বাবার কাছে থাকতে শুরু করেন। ওঁর ভক্তি দেখে বাবা ওঁর জীবনের গতি পরিবর্তন করতে চাইতেন। তাই উনি বালারামের হাতে বারোটা টাকা দিয়ে মছিন্দ্রগড়ে (জেলা সাতারা) গিয়ে থাকতে বলেন। বাবার সান্নিধ্য ছেড়ে অন্যত্র কোথাও গিয়ে থাকার ইচ্ছে মানকরের ছিল না। কিন্তু বাবা ওঁকে বুঝিয়ে বলেন- "তোমার মঙ্গলের জন্যই আমি এই সর্ব্বোত্তম উপায় তোমায় বলছি। ওখানে গিয়ে দিনে তিনবার প্রভুর ধ্যান কোর।" বাবার কথায় বিশ্বাস রেখে উনি মচ্ছিন্দ্রগড়ে যান। সেখানকার মনোহর দৃশ্যে, শীতল জলে এবং স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় ওঁর মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। বাবা যে বিধি বলে দিয়েছিলেন, সেই অনুসারেই উনি প্রভুর ধ্যান করা শুরু করেন এবং কিছুদিন পরই দর্শন পান। বেশীর ভাগ সময় ভক্তরা সমাধি অবস্থায় দর্শন পায়। মানকর সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় উনি দর্শন পান। দর্শন হওয়ার পর মানকর বাবাকে ওঁকে সেখানে পাঠাবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করেন। তাতে বাবা বলেন- "শিরডীতে তোমার মনে নানারকম বিচারধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। তাই আমি তোমায় এখানে পাঠাই, যাতে তোমার চঞ্চল মন শান্ত হতে পারে। তোমার ধারণা ছিল যে, আমি শুধু শিরডীতেই বিদ্যমান এবং সাড়ে তিন হাতের এক পাঁচ তত্ত্বের পুতুল ছাড়া আর কিছুই নই। এবার আমার দর্শন করে এই যাচাই করে নাও যে যাকে তুমি শিরড়ীতে বিরাজমান দেখেছিলে এবং যার দর্শন তুমি এখানে করলে, তারা দুজনে অভিন্ন কি না।" মানকর সেখান থেকে বান্দ্রায় নিজের বাড়ী ফিরে যান। উনি পুণে থেকে দাদার, ট্রেনে যেতে চাইতেন। টিকিট কিনতে গিয়ে সেখানে খুব বেশী ভীড়ে দেখে পিছিয়ে যান। এমন সময় একটি গ্রাম্য লোক, যার কাঁধে একটা কম্বল এবং শরীরে একটা ল্যাঙোট ছাড়া কিছুই ছিল না, মানকরকে এসে জিজ্ঞাসা করে- "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" মানকর জবাব দেন- "দাদার।" তখন লোকটি বলে- "আমার এই দাদারের টিকিটটা আপনি রাখুন, এখানে একটা দরকারী কাজ এসে পড়ায় আমি আজ যেতে পারছি না।" টিকিট পেয়ে মানকর

তো অতিশয় খুশী। পকেট থেকে টাকা বার করতে-করতেই সেই ব্যক্তিটি ভীড়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। মানকর অনেক খোঁজা-খুঁজি করেন কিন্তু তার কোন ফল হয় না। গাড়ী ছাড়া পর্যন্ত মানকর সেই লোকটির জন্য প্রতীক্ষা করেন, কিন্তু সে আর ফিরে আসে না। এই ভাবে মানকর বিচিত্র রূপে বাবার দ্বিতীয় বার দর্শন পান। কিছু দিন নিজের বাড়ীতে থেকে মানকর আবার শিরডী ফিরে আসেন এবং বাবার শ্রীচরণেই দিন কাটাতে শুরু করেন। এখন তিনি সর্বদা বাবার আদেশ পালন করতেন। শেষে এই ভাগ্যবান ব্যক্তি বাবার সামনে তাঁর আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে প্রাণত্যাগ করেন।

৩) তাত্‌য়া সাহেব নুলকর ঃ-

হেমাডপন্ত তাত্‌য়া সাহেব নুলকরের বিষয়ে কোন বিবরণ লেখেননি। শুধু এতটাই লিখেছিলেন যে উনি শিরডীতে দেহত্যাগ করেন। ১৯০৯ সালে যে সময় তাত্‌য়া সাহেব পন্ঢরপুরে উপ-ন্যায়াধীশ ছিলেন, সেই সময়ই নানাসাহেব চাঁদোরকরও ওখানকার মাম্‌লৎদার ছিলেন। এঁরা দুজনে প্রায় দেখা-সাক্ষাত ও গল্প-গুজব করতেন। তাত্‌য়া সাহেবের সাধু সন্তে সে রকম বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু নানাসাহেব ওঁকে সাইবাবার লীলা শোনাতেন এবং একবার শিরডী গিয়ে বাবার দর্শন করার জন্য অনুরোধ করেন। উনি দুটি শর্তে শিরডী যেতে রাজী হন - ১) একজন ব্রাহ্মণ রাঁধুনি পাওয়া চাই ২) উপহার দেওয়ার জন্য নাগপুরের ভালো কমলালেবু পাওয়া চাই। খুব শীঘ্র ওঁর এই দুটি শর্তই পুরণ হয়ে পড়ে। নানাসাহেবের কাছে একটি ব্রাহ্মণ চাকরীর খোঁজে আসে, যাকে উনি তাত্‌য়া সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেন। একটা কমলালেবু পার্শেলও এসে পৌঁছয়। কিন্তু তার উপর প্রেরণকারীর নাম বা ঠিকানা লেখা ছিল না। শর্ত পূরণ হয়ার পর ওঁকে শিরডী যেতেই হয়। প্রথমে বাবা ওঁর উপর রেগে ওঠেন। ধীরে-ধীরে যখন তাত্‌য়াসাহেবের বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, বাবা সত্যি সত্যি ঈশ্বরবতার তখন উনি বাবার শরণাপন্ন হন। তারপর শেষ জীবন অবধি সেখানেই তাকেন। ওঁর শেষ সময় নিকটস্থ জেনে ওঁকে পবিত্র ধার্মিক পাঠ শোনানো হয়েছিল। শেষ সময়ে বাবার চরণামৃত দেওয়া হয়েছিল। ওঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে বাবা বলে ওঠেন- "আরে! তাত্‌য়া তো আগেই চলে গেল। ওর আর পুণর্জন্ম হবে না।

৪) মেঘা ঃ-

অধ্যায় ২৮-তে মেঘার কথা বলা হয়েছে। মেঘার মৃতদেহের সাথে সব গ্রামবাসীরা

শ্মশান পর্যন্ত যায়। বাবাও তাদের মধ্যে সম্মিলিত হন এবং মৃত শরীরের উপর ফুল ছড়ান। দাহ-সংস্কারের পর বাবার চোখ থেকে অশ্রুধারা বইতে দেখা যায়। একজন সাধারণ মানুষের মত তাঁর হৃদয়ও দুঃখে বিদীর্ণ হয়। শরীরটি ফুল দিয়ে ঢেকে এক নিকট আত্মীয়ের ন্যায় কাঁদতে-কাঁদতে বাবা মস্‌জিদে ফিরে আসেন। সদ্‌গতি প্রদান করতে অনেক সন্তদেরই দেখেছি, কিন্তু বাবার মহানতা অদ্বিতীয়। এমন কি বাঘের মত হিংস্র পশুও নিজের রক্ষার জন্য বাবার শরণে আসে। নিম্নে তারই বৃত্তান্ত দেওয়া হয়েছে -

৫) বাঘের মুক্তি ঃ-

বাবা সমাধিস্থ হওয়ার সাতদিন আগে একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে। মস্‌জিদের সামনে একটা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়ায়। তার মধ্যে একটা বাঘ বাঁধা ছিল। ওর ভয়ানক মুখটা গাড়ীর পিছনের দিকে ছিল। বাঘটা কোন একটা অজ্ঞাত কষ্টে ভুগছিল। বাঘের মালিক তিনজন দরবেশী এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গিয়ে ওর প্রদর্শন করত এবং এই ভাবে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করত। তাদের ঐ ছিল জীবিকা। ওরা বাঘটির চিকিৎসার সবরকম চেষ্টা করে, কিন্তু সব কিছু ব্যর্থ হয়। শেষে কোন এক জায়গায় ওরা বাবার কীর্তির কথা শুনে বাঘটিকে নিয়ে বাবার দরবারে আসে। হাতে শিকল ধরে ওরা বাঘটিকে মস্‌জিদের দরজায় দাঁড় করিয়ে দেয়। বাঘটি ছিল রোগাক্রান্ত, ক্রুদ্ধ ও অস্থির। সবাই ভয় ও আশ্চর্য্যের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছিল। ওরা তিনজন ভেতরে গিয়ে বাবাকে সব কথা জানিয়ে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে বাঘটিকে বাবার সামনে নিয়ে যায়। সিঁড়ির কাছে পৌঁছেই বাবার তেজপুঞ্জস্বরূপ দর্শন করে বাঘটি পেছনে সরে গিয়ে মাথা নীচু করে নেয়। পরে দুজনের চোখাচুখি হতেই বাঘটি সিঁড়ির উপর চড়ে গিয়ে বাবাকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকে। লেজ নাড়িয়ে তিনবার মাটিতে ঝাপটায় এবং সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণত্যাগ করে। ওকে মৃত দেখে তিনজন দরবেশী অতিশয় নিরাশ ও দুঃখী হয়। কিছুক্ষণ পর ওদের বোধ হয় যে, প্রাণীটা রোগগ্রস্ত তো ছিলই এবং ওর আয়ু ফুরিয়ে এসেছিল। যাক্, ওর জন্য ভালই হলো যে, বাবার মত সন্তের চরণে সদ্‌গতি পেলো। বাঘটি ওদের কাছে ঋণী ছিল এবং ঋণ শোধ হতেই ও মুক্ত হয়ে সাই চরণে সদ্‌গতি প্রাপ্ত করে। **যদি কোন প্রাণী কোন সন্তের চরণে মাথা রেখে প্রাণত্যাগ করে, তাহলে তার মুক্তি লাভ হয়।** পূর্ব জন্মের শুভ সংস্কারের অভাবে এরকম সুন্দর পরিসমাপ্তি কি করে সম্ভব হতে পারে?

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।